35 দৈনিক সংবাদ

তারিখ .. 21 OCT 1991
পৃষ্ঠা... 8 ...কলাম... 6

পরীক্ষা ঃ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

মাত্র কিছুদিন আগে দেশের চারটি বোর্ডের মধ্যে দু'টির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সচরাচর একই সঙ্গে চারটি বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং একই সঙ্গে ফলও প্রকাশিত হয়। এবারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল, কারণ সাম্প্রতিক সাইক্লোনে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পরীক্ষায় বসতে পারবে না, এটা শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষেরা জানতেন। পরীক্ষা পিছাতে হবে, এ দাবী উঠবার আগেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার।

যদিও মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে অর্ধেক, তবু গুণতিতে কম নয়; ঢোল-শোহরতেও কম নয়। পরীক্ষার বিস্তারিত ফল বেরোল দৈনিক পত্রিকাগুলোর কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। আর পরীক্ষায় যারা শীর্ষস্থান দখল করেছে, সেই ছাত্রছাত্রীদের সচিত্র পরিচয় কয়েকদিন ধরে প্রতিটি দৈনিকের অন্যতম আকর্ষণীয় সংবাদ হয়ে পরিবেশিত হল। আমাদের সময়ে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেকার কথা, এ রকম কিছুই হত না। পরীক্ষার বিস্তারিত ফল আমরা পেতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে। শীর্ষস্থান অধিকারী দশ-বিশজনের নাম প্রকাশ-যোগ্য সংবাদ ছিল অবশ্যই, কিন্তু এই নিয়ে কোন চটকদার সংবাদ চোখে পড়েনি। কার পাঠাভ্যাস কি ছিল, কে কতোজন গৃহশিক্ষকের সেবা পেয়েছে বা পায়নি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন কার কি রকম দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এগুলো পরিণত হয়েছে মৃদু উত্তেজনাপূর্ণ স্বাদু সংবাদে। এই বয়সে এজন্য মোটেও ঈর্ষান্বিত হচ্ছি না, তবে কিছুটা কৌতুক বোধ করছি। নিন্দুকেরা এর মধ্যে কিঞ্চিৎ অসূয়ার আভাস পেতে পারেন।

শুধুই কৌতুক নয়। পরীক্ষার ফল নিয়ে, ঈর্ষণীয় সাফল্য নিয়ে, এতটা হইচই আমি দেখতে পাচ্ছি, অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না। আমিও তাদের দলে। কারণ এর একটা ক্ষতিকর দিক আছে। অল্পবয়সে পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের কারণে এতখানি পাদপ্রদীপে আসা ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য ভালো হতে পারে না। এটা তাদের মনে অহেতুক অহংকার, আত্মম্ভরিতার জন্ম দিতে পারে এবং এই ধারণা তাদের হতে পারে যেন জীবনে সাফল্যের এটাই শেষ কথা। কচি বয়সে ছেলেমেয়েদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

এত গেল একটা দিক। পরীক্ষার ফল নিয়ে সংবাদপত্রের অতিরিক্ত উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস ক্ষতিকর অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও, আর আমি মনে করি- এই ক্ষতি সম্যক নয় বা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় বলেই এটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। এই উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস প্রায় পুরোপুরিভাবে আড়াল করছে একটি সত্যকে: আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা অসংখ্য ভুলে ভরা, ও অসংখ্য দুর্নীতি ও দুরাচারে ঘেরা।

প্রথমে ভুলের কথায় আসি। প্রশ্নপত্রে ভুল হয়ে যায়, কখনো-সখনো, সেটাকে না হয় গুরুত্ব নাই দিলাম। কিন্তু পরীক্ষকের খাতা দেখায়, মূল্যায়নে বিস্তর গরমিল ধরা পড়ছে। পরীক্ষকের সঙ্গে পরীক্ষকের গুণগত, মানগত ও চরিত্রগত গরমিল আছে। বিগত দশকগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পরীক্ষকের সংখ্যা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় শীর্ষ পরীক্ষক (হেড এক্সামিনার) থেকে শুরু করে পরীক্ষক প্রায় সবাই মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষিকা। যতোদূর জানি। পূর্ব প্রচলিত নিয়মে যে কিছুসংখ্যক কলেজের অধ্যাপক মাধ্যমিক পরীক্ষায় খাতা দেখার দায়িত্ব পেতেন, সেটা স্কুল শিক্ষকদের প্রবল আপত্তির কারণে বন্ধ হয়েছে। একইভাবে বন্ধ হয়েছে শীর্ষ পরীক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে নির্বাচন। এতে আপত্তি করব না, কারণ যে পর্যায়ের শিক্ষকেরা ক্লাসে পড়াচ্ছেন, তারাই ভালো বিচারক হবেন। প্রশ্ন হলো, এই বিচারকের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সকল পরীক্ষকের আছে কিনা। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে। এক্ষেত্রে অযোগ্যতার ব্যাপক সমাবেশ হয়েছে। অযোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা। বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে চাপাচাপির মধ্যে পরীক্ষকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেন, তাতে এই প্রবণতা বাড়ে। ফাঁকি যতোটুকু ধরা পড়ে ও সংবাদপত্রে আসে, তা থেকে পুরো পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। ফাঁকি দিয়ে হাত পাকিয়েছেন এমন পরীক্ষকেরা প্রায়ই ধরা না পড়ার ফিকির হিসেবে একটা কাজ করেন, তারা একটা নিরাপদ বলয়ের মধ্যে মার্ক দিয়ে যান, কমও নয়, বেশীও নয়। যাতে শীর্ষ পরীক্ষকেরা বুঝতে না পারেন। কারণ শীর্ষ পরীক্ষকদের কাজ পাস-ফেলের সীমান্তবর্তী খাতা ও ঊর্ধ্বচারী নম্বরওয়ালা খাতাগুলো দেখা। কিন্তু এইসব চতুর পরীক্ষকের 'সমদর্শিতার' শিকার হয়ে যারা লেটার মার্ক-এর দাবীদার, অথচ মুখ থুবড়ে পড়ে রইল পঞ্চাশ-ষাটের ধূসর জগতে, তারা অমোচনীয়ভাবে এক অবিচারের শিকার হল। এই অন্যায়ের ও অবিচারের কোন প্রতিকার নেই, প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায়।

পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের দুর্নীতি একটা বহুল আলোচিত বিষয়। ব্যাপকভাবে নকল প্রবণতা আছে এবং এই প্রবণতার বিরুদ্ধে হালে কর্তৃপক্ষ বেশ কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হচ্ছে, সেই সঙ্গে তাদের নকলে সহায়তাকারী কিছুসংখ্যক পরীক্ষাহলের তদারককারীও। এরা সবাই শিক্ষক। নকলকারী ও নকলে সহায়তাকারী ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়েই আসলে একই অসুস্থতার অংশ। এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি — এই দু'টি বৃহত্তম পরীক্ষায় যে প্রতিবছর কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর ওপর নেমে আসছে বহিষ্কারের দণ্ড, এতে অনেকেই উল্লাস বোধ করছেন, পরীক্ষায় নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে আসছে এই আনন্দে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর কি হতে পারতো! এতে আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার উপর চূড়ান্ত ধিক্কার ছাড়া কিছু নয়।

'একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে, পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে, নকলকারী ও নকলে সহায়তাকারীদেরকে জব্দ করে, যে ফলটুকু পাইয়া গেল, তার কিঞ্চিৎ মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু এদিয়ে সমস্যার সমাধান হল না। শিক্ষাব্যবস্থায় যে ধস নেমেছে, সেটা ঠেকানো গেল না। বরং এই সংবাদটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে একটা মিথ্যাকে মহিমান্বিত করা হল ঃ পরীক্ষাই আসল বস্তু শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে। কিন্তু যারা শিক্ষা ব্যাপারটিকে জানেন ও বোঝেন, তারা ঠিকই জানেন যে, পরীক্ষার মূল্য ও অবস্থান প্রান্তিক, কেন্দ্রীয় নয়। শিক্ষার পুনর্গঠনে, শিক্ষার সংস্কারে অনেক বেশী কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হল পাঠ্যবিষয় — পাঠক্রম ও শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া ও তার কার্যকারিতা।

এসবই জানা কথা। তবু সংবাদপত্রের হেডলাইন তৈরী হয় — পরীক্ষার ফল নিয়ে, পরীক্ষায় সাফল্য নিয়ে। এর কারণ ক্রীড়া জগতের ঘটনার মতো পরীক্ষার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তার একটা দৃশ্য-মূল্য আছে, অতএব সংবাদ-মূল্য আছে। আর সংবাদপত্র যখন সেটাকে মূলধন করছে, সেটাকে চাঞ্চল্যকর করে তুলছে, তখন অজান্তেই সমূহ ক্ষতি করছে। কারণ পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই যে একটি বালুভিত্তিক সৌধ ছাড়া কিছু নয় — এদেশে গত কয়েক দশক ধরেই নয়- সেই কালো সত্যটা চাপা পড়ে যাচ্ছে এক অহেতুক উত্তেজনার আড়ালে।

ক'দিন আগে দেশের একটি দৈনিকে একজন ক্ষুব্ধ পত্রলেখকের একটি চিঠিতে আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতিত্বকে বেশ একটু বাঁকা চোখে দেখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এই কৃতিত্ব গুটিকয় ভাগ্যবান তরুণের এমন এক ধরনের অর্জন যার প্রকৃত মূল্য বেশী নয়। পরীক্ষায় উচু নম্বর পাওয়া আজকাল অনেকটা যান্ত্রিকতায় ও অনিবার্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। সঠিক স্কুল, সঠিক সহায়তা ও সঠিক মুখস্থ — এরই যোগফল হল পরীক্ষায় কৃতিত্ব। কথাটা পুরো সত্য নয়, অবশ্যই, তবে যদি অর্ধসত্যও হয়, তাও যথেষ্ট আমাদের ভাবাবার জন্য।

পরীক্ষায় কৃতিত্বকে আমি খাটো করে দেখতে চাইনে। পরীক্ষাব্যবস্থার সকল ত্রুটিকে স্বীকার করে নেয়ার পরও, এই কৃতিত্বের কিছুটা মূল্য অবশিষ্ট থেকেই যায়। যারা এই কৃতিত্ব অর্জন করল, তাদের কিছু পরিচিতি যদি সংবাদপত্রে আসে তা আসুক, কিন্তু সংবাদ পরিবেশনায় আতিশয্য ও উচ্ছলতা বর্জনীয়। আরও একটি কথা। সাংবাদিকেরা প্রতিবছর শুধু সাফল্য সংবাদ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করবেন কেন? সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি সামগ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ছবি আছে। সেই ছবিটিকে স্পষ্ট করে দেখতে হলে একটু গভীরে যেতে হয়। পরীক্ষায় কৃতিত্ব যেমন পরীক্ষার্থীর, তেমনি তার প্রতিষ্ঠানেরও। এর বিপরীত ব্যাপারটিও সত্য। বেশ কিছু দিন থেকে সাফল্যের তালিকায় গুটিকয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে-ফিরে আসছে, বিশেষত ক্যাডেট কলেজগুলো। ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা শুধু ভালো ছাত্র নয়, তারা একটি আদর্শ পরিবেশে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে, উপরন্তু পাচ্ছে তাদের শিক্ষকদের সযত্ন শিক্ষাদান, পরামর্শ, সহায়তা। তারা আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছে বলে একটি অভিযোগ আছে। অন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় ভিন্নকেন্দ্রে, ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে, পরিচিত পরিবেশেই পরীক্ষা দিয়ে থাকে। পরীক্ষাকেন্দ্রের তদারকিও করে থাকেন তাদেরই শিক্ষকেরা। এর ফলে তারা একটি মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা পায়, যা থেকে অন্যেরা বঞ্চিত। রাজধানীর গুটিকয় মর্যাদাবান স্কুলের ছাত্র হওয়ারও কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে ওই স্কুলের ছাত্ররা। সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অসমতা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মেনে নেয়া যায়। তার বেশী হলেই পুরো ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য আমাদের ন্যায়-নীতিবোধকে পীড়িত করে। সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ছে তার অশুভ প্রভাব। যে বৈষম্য আমাদের পরাধীনতার যুগে ছিল না, স্বাধীনতার সময়ে তাই প্রকট হয়ে উঠছে, অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মধ্যে প্রকৃত উদ্বেগের বা সচেতনতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শত অব্যবস্থা সত্ত্বেও পরীক্ষাই সংবাদ হচ্ছে, শিক্ষা নয়। মুখ্য প্রসঙ্গ আড়ালে চলে যাচ্ছে, গৌণ প্রসঙ্গ আসর জুড়ে বসছে। এসএসসি ও এইচএসসি — দু' বছরের ব্যবধানে দু'টি পাবলিক এক্সামিনেশন আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা কথাটা উঠেছে। ন্যায়সঙ্গতভাবেই। প্রথমটি থাক, দ্বিতীয়টিকে তুলে দেয়া সম্ভব না হলেও কাটছাঁট করে অনেক বেশী উদ্দেশ্যমুখী করা হোক, এমনভাবে যাতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী না হয়। এতে সময় বাঁচবে, পয়সা বাঁচবে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য কারা যোগ্যতা অর্জন করল, সেই সংবাদটি একটি সহজতর পন্থায় পাওয়া যাবে। এখনই সময় এসেছে এসব কথা গভীরভাবে ভেবে দেখার ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের।